# নৈরাষ্ট্রবাদ (Anarchism)

নৈরাষ্ট্রবাদ এমন এক মতবাদ যেখানে রাষ্ট্রবিহীন বা সরকারবিহীন রাষ্ট্র বা সমাজের কল্পনা করা হয়। রাষ্ট্র-কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা প্রসঙ্গেই বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এই মতবাদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। নৈরাষ্ট্রবাদের আবির্ভাবের ইতিহাস আমাদের একটু জানা প্রয়োজন। ১৯২০ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তকাল ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সময়ে ইউরোপের দুটি দেশ ইটালী ও জার্মানীতে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইটালীর ফ্যাসীবাদে আঙ্গিক মতবাদের এবং জার্মানীর নাৎসীবাদে ভাববাদ সম্মত গোষ্ঠীচেতনাবাদের প্রভাব স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়।

ইটালীর সর্বময় কর্তা (dictator) এবং ফ্যাসীবাদের (যা এক উগ্র জাতীয়তাবাদ) প্রতিষ্ঠাতা মুসোলিনী (Mussolini) সমগ্র ইটালী রাষ্ট্রকে এক জীব দেহরূপে গণ্য করে তাঁর গ্রন্থে বলেন, ইটালী জাতি এমন এক জীবদেহ যার লক্ষ্য আছে, প্রাণ আছে, এবং কোন ব্যক্তি বা দল অপেক্ষা উন্নত ধরনের ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তি ও কর্মপদ্ধতি আছে। ঠিক একইভাবে জার্মানীর সর্বময় কর্তা এবং নাৎসীবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিটলার(Hitler) সমগ্র জার্মান জাতির, ব্যক্তি-মন অতিরিক্তভাবে এক সমষ্টিগত-মন বা সমাজ-মন স্বীকার করে বলেন যে, রাষ্ট্রই সব, রাষ্ট্রের ইচ্ছাই ব্যক্তির ইচ্ছা, রাষ্ট্রের কল্যাণই ব্যক্তির কল্যাণ- ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা কল্যাণ বলে কিছু নেই, থাকতেও পারে না, ব্যক্তি-মন সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র-মনের অর্ন্তভূক্ত।

এই দুই চরম কর্তৃত্ববাদী মতবাদের বৈশিষ্ট্য হল, ‘বিচার-বুদ্ধির প্রতি অনাস্থা এবং আবেগজাত স্বজ্ঞার প্রতি অতিরিক্ত আস্থা এবং সেই সঙ্গে বীর-পূজা (hero worship)। চরম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের অপর এক বৈশিষ্ট্য হল যুদ্ধ-প্রীতি, কেননা মতবাদটিতে বলা হয় যে, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সাবালকত্ব লাভ করতে পারে। ফ্যাসীবাদী মুসোলিনী বলেন, ‘স্ত্রীলোকের কাছে তার দৈহিক পূর্ণতা যতটা কাম্য, পুরুষের কাছে যুদ্ধ ততটাই কাম্য’।

দার্শনিক নিৎসে (Nietzsche) কে উদ্ধৃত করে মুসোলিনী বলেন যে, ‘শান্তির উপায় হিসাবে যুদ্ধ কাম্য এবং সেই শান্তি দীর্ঘস্থায়ী না হওয়াই শ্রেয়। হিটলারের উগ্র নাৎসীবাদ আবার একটি একান্ত ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত - ‘দীর্ঘদেহী শ্বেতকায় জার্মানদের দেহেই বিশুদ্ধ আর্যরক্ত, আর সব জাতির দেহে, বিশেষত ইহুদীদের দেহে বিজাতীয় ও অশুদ্ধ রক্ত’। নাৎসীদের এই একান্ত ভ্রান্ত ধারণার ফলে মানুষের ইতিহাস অনেক নারকীয় হত্যাকাণ্ডে কলঙ্কিত হয়েছে। এভাবেই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকাল পাশ্চাত্যের দুটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের খামখেয়ালীপনায় মানব ইতিহাস অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মসীলিপ্ত হয়েছে।

## নৈরাষ্ট্রবাদ (Anarchism)

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে ঐ সকল কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তি-মানুষের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, নেই কোন ইচ্ছা, আত্মবিকাশের কোন উপায় বা পথও নাই। ব্যক্তি-মানুষ রাষ্ট্রের একীভূত হওয়ায় রাষ্ট্রের ইচ্ছাতেই ব্যক্তির সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় এবং রাষ্ট্রের ইচ্ছাতেই, যেখানে ব্যক্তির ইচ্ছা না থাকলেও, যুদ্ধে যোগদান করে তাকে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করতে হয়। এই প্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতা বিলোপকারী কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের প্রতিবাদ বা বিরোধীতাই হল নৈরাষ্ট্রবাদ, কারণ কি নৈরাষ্ট্রবাদীরা চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী।

মার্কসীয় সাম্যবাদীরা যেমন বিশ্বাস করেন যে, প্রলেতারিয়েতদের রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করার পর কোন একদিন রাষ্ট্র ব্যবস্থারই উচ্ছেদ হবে এবং সাম্যবাদী সমাজের উত্থান হবে, ঠিক তেমনিভাবে গড্উইন্(Godwin) ক্রোপট্কিন্(Kropotkin) এবং ম্যাক্স স্টারনার (Max Stirner) প্রভৃতি নৈরাষ্ট্রবাদীরাও বিশ্বাস করেন যে, বিপ্লবোত্তর পর্যায়ে, শ্রমজীবী বা প্রলেতারিয়েতদের প্রতিষ্ঠিত অর্ধরাষ্ট্র-ব্যবস্থাও একদিন বিলুপ্ত হবে এবং সমাজের এক স্বাধীন সংস্থা রাষ্ট্রের স্থান অধিকার করবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি জনস্বার্থবিরোধী অকল্যাণজনক প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করলেও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন না, তারা কেবল রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করতে বলেন। নৈরাষ্ট্রবাদীরা রাষ্ট্রকে সর্বৈব অকল্যাণজনকরূপে গণ্য করে রাষ্ট্রের অবলুপ্তির জন্য সচেষ্ট হন।

এমতাবস্থায় প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক যে, রাষ্ট্রবিহীন অবস্থা কি মানুষের বাসযোগ্য হতে পারে ? আমরা এ ব্যাপারে অ্যারিসটটলের বিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করতেই পারি - 'যে মানুষ সমাজে বাস করেনা, সমাজজীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, সেই অসামাজিক মানুষ হয় পশু, না হয় দেবতা'। নৈরাষ্ট্রবাদীদের মতে, উক্তিটি 'সমাজ' সম্পর্কে সত্য হলেও রাষ্ট্র সম্পর্কে সত্য নয়, কেন কি রাষ্ট্র সমাজ নয়। রাষ্ট্র হল সমাজের এক কৃত্রিম সংগঠন। কৃত্রিম সংগঠন বাতিল করেও মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন সম্ভব। নৈরাষ্ট্রবাদীরা মনে করেন যে, মানুষের স্বভাব ক্রমশঃই এমন পরিশুদ্ধ হবে যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে বাতিল করলেও এমন কতকগুলি স্বাভাবিক ও স্বাধীন আঞ্চলিক সংস্থা বা সংগঠন গঠন করবে যেখানে সংস্থার সদস্যরা সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে।

এমন এক রাষ্ট্রবিহীন, সরকারবিহীন সমাজে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আইনের কাছে আত্মসমর্পণের প্রয়োজন হবে না অথবা কোন কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতা বা আনুগত্যের প্রয়োজন হবে না। এমন এক রাষ্ট্রবিহীন সমাজ ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য, ভোগের জন্য, সভ্য জীবনের বহু বিচিত্র প্রয়োজন ও কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য অঞ্চল-বিশেষে নানা ধরনের বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীর উদ্ভব হবে এবং সেই সব আঞ্চলিক বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীর সংহতিসাধনের মাধ্যমে মানুষের জীবন সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত হবে, যেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি স্বাধীনভাবে বসবাসের সুযোগ পাবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ভোগ্যপণ্য লাভ করতে সমর্থ হবে।

নৈরাষ্ট্রবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এমন এক নৈরাষ্ট্রবাদী সমাজেই, বাইরে থেকে কোন রাষ্ট্রের বা সরকারের শাসন বা নিয়ন্ত্রণ না থাকার জন্য, ব্যক্তি তার স্বাধীন সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে, সাধ্যমত অর্ন্তনিহিত নিজ নিজ সামর্থ্যকে উপলব্ধি করে ব্যক্তিত্বের যথাসম্ভব বিকাশ সম্ভব করতে পারে। এমন এক রাষ্ট্রবিহীন ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই ব্যক্তি তথা সমাজের উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে। নৈরাষ্ট্রবাদীরা মনে করেন যে, এমন এক সমাজ-ব্যবস্থাই হল সর্বজনীন সাম্যবাদ। জীবনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর উৎপাদনে যদি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ অংশগ্রহণ করে, তাহলে উৎপাদিত সামগ্রীর প্রতি প্রত্যেকের সমান অধিকার থাকে।

নৈরাষ্ট্রবাদীরা কেবল কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রেরই বিলোপ সাধনের উল্লেখ করেন না, তাঁরা যে-কোন ধরনের রাষ্ট্রের - বর্তমানের অথবা ভবিষ্যতের - বিরূপ সমালোচনা করেন, কেননা রাষ্ট্র মাত্রই জনসাধারণের - শ্রমজীবী মানুষের-স্বাধীনভাবে জীবনধারণের পরিপন্থী। রাষ্ট্রের কর্মচারীমাত্রই আমলাতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হওয়ায় শ্রমজীবী মানুষের আশা-আকাঙখার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারে না। যে সকল বস্তুতে মানুষের ন্যায়সম্মতভাবে সমান অধিকার, রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মুষ্টিমেয় শাসকগণ সেই সকল বস্তুতে অন্যায়ভাবে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাও জনসাধারণের কল্যাণসাধনে ব্যর্থ হয়।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কতিপয় লোক বহুজনের অভাব-অভিযোগের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু কোন লোকের পক্ষেই অন্য কোন লোকের প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়, কেননা একজন লোকের পক্ষে অন্য কোন লোকের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে পারে না। ব্যক্তি কেবল নিজের কামনা-বাসনাকে সম্যক উপলব্ধি করে সেসব অপরের নিকট উপস্থাপিত করতে পারে। কাজেই প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, মানুষের চাহিদা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকায়, রাষ্ট্র পরিচালকগণ কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন না

নৈরাষ্ট্রবাদীদের মতে, রাষ্ট্র-ক্ষমতা মানুষের চরিত্রকে কলুষিত করে। রাষ্ট্র-ক্ষমতার প্রভাবে শাসক হয়ে পড়ে স্বার্থপর, উদ্ধত, দাম্ভিক, নিপীড়ক এবং যারা তাদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে তাদের প্রতি অবহেলাপরায়ণ। এ প্রসঙ্গে সি.ই.এম. জোড (C.E.M. Joad ) তাঁর An Introduction to Modern Political Theory নামক গ্রন্থে বলেন, 'স্বভাবগতভাবে একজন রাজনীতিবিদ মন্দলোক নয়, তার পদমর্যাদাই তাকে মন্দ করে।। মানুষ বলেই সে মন্দ নয়, মন্দ হয় সে রাজনীতিবিদ হওয়ার জন্য'। আর এজন্যই নৈরাষ্ট্রবাদীরা মনে করেন যে, কোন সৎ মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের ভার গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

রাষ্ট্র-পরিচালক লোভী ও ক্ষমতাভোগী হলে সৎ মানুষও, রাষ্ট্র-ক্ষমতার অপপ্রয়োগের জন্য, ঘৃণ্য মানুষে পরিণত হয়। নৈরাষ্ট্রবাদী ক্রোপট্‌কিন্‌ এজন্য বলেন, 'ক্ষমতাচ্যুত হলে যে-কোন ঘৃণ্য মন্ত্রীও সৎ, জনকল্যাণকামী ও বিশ্বাসভাজন হতে পারে। রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিকারী হলে বন্ধু শত্রু হয়, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হয়। রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কৌশলপূর্বক আভ্যন্তরীণ সংঘাতকে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াকে উৎসাহিত করে। নৈরাষ্ট্রবাদীরা তাই বলেন, রাষ্ট্র থাকার অর্থ হল; পরাধীনতা, বহিষ্কার এবং বিচ্ছেদ আর রাষ্ট্র বিলুপ্তির অর্থ হল; স্বাধীনতা, একতা ও সদ্ভাব।

নৈরাষ্ট্রবাদীরা জীবনের কোন ক্ষেত্রেই - জনশিক্ষা, দেশরক্ষা, ব্যক্তির নিরাপত্তা ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই - রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন না। রাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থায়, উচ্চ-বর্গের কিছু মানুষ লাভবান হলেও নিম্ন-বর্গের মানুষ লাভবান হয় না। শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হলে সরকার নির্বচিত উচ্চ-বর্গের কয়েকজন শিক্ষকের পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্য থেকে শিক্ষাদানে আগ্রহী ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে হবে। সরকারী ব্যবস্থার যান্ত্রিক নিয়মে প্রকৃত শিক্ষাদান সম্ভব হতে পারে না। শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের প্রেম ও ভালোবাসা না থাকলে ‘মানুষ’ গড়া যায় না।

শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের স্থায়ী সেনাবাহিনীও রাখার প্রয়োজন নেই, কারণ দেশের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য-প্রমাণ। বেতনভুক্ত রাষ্ট্রীয় সেনাগণ তাদের পেশার খাতিরে যুদ্ধ করে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের জন্য নয়। আর এজন্যই বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয়। রাষ্ট্রকে বাতিল করে। যদি রাষ্ট্রবিহীন সমাজের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে একযোগে বহিঃশত্রুকে প্রতিরোধ করে, কেবল তাহলেই স্থায়ীভাবে দেশরক্ষা সম্ভব হতে পারে।

রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ব্যক্তির নিরাপত্তাকেও নিশ্চিত করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, যেসব অসামাজিক অসাধু প্রকৃতির লোক ব্যক্তির নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, রাষ্ট্রব্যবস্থাই ঐ সব অসামাজিক লোকের স্রষ্টা। রাষ্ট্রের পক্ষপাতদুষ্ট অর্থনীতির ফলে - ধনীর ধনবৃদ্ধি এবং দরিদ্রকে নিঃস্ব করা, এমন অর্থনীতির ফলে নীচুতলার মানুষের যে দুর্দশার সৃষ্টি হয় সেটাই তাদের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করে। কাজেই, ব্যক্তির জীবনের ও সম্পদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উচ্ছেদের প্রয়োজন।

সর্বোপরি, রাষ্ট্রের বিশেষত কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের কঠোর বিধি-ব্যবস্থা কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য, বিজ্ঞান, দর্শন, এক কথায় সংস্কৃতি জগতের পরিপন্থী। এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিষয় প্রকাশই হল চরম মূল্যবান, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের বিধি-নিষেধ মান্য করেই কবিকে কাব্য রচনা, গল্পকারকে গল্প রচনা, গায়কের সুর-বিন্যাস, নাট্যকারের মঞ্চাভিনয়, বিজ্ঞানী ও দার্শনিককে আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে হয়। প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এমনটাই উল্লেখ করেছেন। কাজেই এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক উন্নতি ঘটাতে হলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে কবি, শিল্পী প্রভৃতির জন্য স্বাধীনভাবে বিষয় প্রকাশের পথ উন্মুক্ত রাখতে হবে।

নৈরাষ্ট্রবাদীরা বলেন যে, রাষ্ট্রের পরিবর্তে বিভিন্ন স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমিতির মাধ্যমে, মানুষ স্বাধীনভাবে ক্রিয়াকলাপের সুযোগ লাভ করতে পারে, কেননা এইসব স্বেচ্ছামূলক সংঘ বা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার পথে কোন বাধা সৃষ্টি না করে সহযোগিতার ভিত্তিতে কর্মসাধন করে।

এভাবে, নৈরাষ্ট্রবাদীরা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে স্বেচ্ছামূলক আঞ্চলিক সংঘ-সমিতির ওপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করেন।

সমালোচনা ঃ

কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের প্রতিবাদে নৈরাষ্ট্রবাদীরা কেবল কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের বিলুপ্তির উল্লেখ করেননি, সকল রকম রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিলুপ্তিরও উল্লেখ করেছেন, যাকে কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত মতবাদরূপে গ্রহণ করা চলে না। সমাজের সকল মানুষের জীবনে অকস্মাৎ কোন একদিন হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ইত্যাদি অপসৃত হওয়ার ফলে মানুষের স্বভাব এমনই পরিশুদ্ধ হবে যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সর্বৈব পরিত্যাগ করে তারা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কতকগুলি স্বেচ্ছামূলক সংঘ-সমিতি গঠন করে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করবে - এ এক কবিকল্পনা। নৈরাষ্ট্রবাদীদের মতবাদ অনুসারে, 'অকস্মাৎ আমরা এমনই এক রাষ্ট্র-বিহীন রামরাজ্যে উপনীত হবো যেখানে সবাই স্বভাবগতভাবে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাল'। এও এক আবেগমূলক কল্পনাশ্রয়ী মতবাদ যার কোন যুক্তগ্রাহ্য ভিত্তি নেই। 'চরম ভাবপ্রবণ হওয়ার জন্যই নৈরাষ্ট্রবাদীদের মতবাদটি কোন দেশেই গ্রাহ্য হতে পারে নি।

বাস্তবিকপক্ষে, চরম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের অবসান ঘটানো সম্ভব হলেও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো সহজ কথা নয় - এক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পতন হলে তার স্থানে অপর এক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে অর্থাৎ সভ্য সমাজে কোন-না-কোনভাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে। সভ্য জটিল, সমাজে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থারূপে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না। সকল প্রকার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অর্থাৎ রাষ্ট্রের উচ্ছেদ এক অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কার্ল মার্কসও এমন এক রাষ্ট্রবিহীন সাম্যবাদী সমাজের (Communism) কল্পনা করেছিলেন। সামাজিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে মার্কসের অভিমত হল - কর্তৃত্ববাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নির্যাতীত ও নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণী একদিন বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের উচ্ছেদ হবে না - রাষ্ট্র ক্ষমতা কেবল হস্তান্তরিত হবে, বণিক শ্রেণীকে পরিজিত করে শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করবে।

মার্কস এ প্রকার সমাজতন্ত্রকে সামাজিক পরিবর্তনের চরম লক্ষ্য বলেন নি। সামাজিক পরিবর্তনের চরম লক্ষ্য হল, শ্রেণীহীন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা। সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদী ধনিক শ্রেণীর উচ্ছেদ করে শ্রমজীবিরা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও তা পুরোপুরি সম্ভব হয় না, কেননা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য শাসকদলের প্রয়োজন হয় এবং ফলত শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতা ও অধিকারগত বৈষম্য থাকে। কাজেই এই অবস্থাতেও সমাজে জনগণের দাবী সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাষ্ট্রই হল শোষণ যন্ত্র এবং সেজন্য রাষ্ট্রের পুরোপুরি উচ্ছেদ না হলে অর্থাৎ নৈরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে, সবল কর্তৃক দুর্বলের শোষণের অবসান হতে পারে না।

তবে মার্কস আশা করেন যে, অর্থাৎ কল্পনাশ্রয়ী বস্তুবাদী দার্শনিকরূপে মার্কস স্বপ্ন দেখেন যা, দীর্ঘদিন সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে বসবাস করে মানুষের অন্তর ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ হবে এবং তখন এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হবে যে শোষণ যন্ত্ররূপে রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। অনাগত ভাবী সমাজের এমন এক অবস্থাকেই মার্কস রাষ্ট্রবিহীন সাম্যবাদী অবস্থা (Communism) বলেছেন। ভাবীকালের এমন এক সাম্যবাদী সমাজে মানুষ তার বস্তুগত পরিবেশের অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিবেশের (একদল বিত্তবান, অন্য একদল নিঃস্ব-এমন পরিবেশের) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে তার কলুষমুক্ত অন্তরের দ্বারা, মানবিক বোধের দ্বারা, প্রেম ও ভালোবাসার দ্বারা পরিচালিত হবে। এমন এক অনালব্ধ আদর্শ সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকে তার সাধ্য ও সামর্থ্য মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে।

নৈরাষ্ট্রবাদীরাও একইভাবে রাষ্ট্রবিহীন সমাজের কল্পনা করেন অর্থাৎ স্বপ্ন দেখেন। পার্থক্য হল, মার্কসের মতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন বসবাস করে ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরশুদ্ধি হলে রাষ্ট্রবিহীন সাম্যবাদী সমাজের আবির্ভাব ঘটবে; পক্ষান্তরে গডউইন, ক্রোপট্‌কিন প্রভৃতি নৈরাষ্ট্রবাদীদের মতে, কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে বসবাস করে অকস্মাৎ মানুষের অন্তরশুদ্ধি হলে রাষ্ট্রবিহীন সমাজের আবির্ভাব ঘটবে। তবে, এপ্রকার পার্থক্য স্বীকার করেও বলতে হয়, রাষ্ট্রবিহীন সমাজ সম্পর্কে দুটি ক্ষেত্রেই মতবাদ আবেগ-ভিত্তিক নিছক কল্পনা বা অতিকথা(myth)। 'অন্তরশুদ্ধির ফলে কোন একদিন মানুষ দেবত্বে উন্নীত হবে এবং তখন আর রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না'। এটি শুধু অবাস্তব এক কল্পনাশ্রয়ী মতবাদ ছাড়া আর কিছুই না। নৈরাষ্ট্রবাদীরা যে সকল স্বতঃস্ফূর্ত আঞ্চলিক সংঘ-সমিতির উল্লেখ করেন তাদের পরিচালনার জন্যেও কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকা অত্যাবশ্যকরূপে দেখা দেয় এবং সেই কেন্দ্রীয় সংগঠনই রাষ্ট্রের স্থান দখল করে।

বাস্তবিকপক্ষে, সভ্যসমাজে রাষ্ট্রবিহীন মানুষের জীবন কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রবিহীন সমাজে বসবাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ তার নিরাপত্তার জন্য, সম্পদ সুরক্ষার জন্য ও স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের জন্য রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র এক কৃত্রিম সংগঠন হলেও আজকের সভ্য মানুষের জীবনে তাকে আর উচ্ছেদ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের উচ্ছেদ নয়, প্রয়োজনীয় হল রাষ্ট্র-পরিচালনা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন। আজকের সভ্য মানুষ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সেই রাষ্ট্র-পরিচালনা ব্যবস্থাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যা সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ ও আনন্দ দিতে সমর্থ। সার কথা হল, সমাজ-ব্যবস্থার অবসান যেমন চিন্তা করা যায় না, আজকের জটিল সভ্য সমাজে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অবলুপ্তিও তেমনি চিন্তা করা যায় না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ